বাংলাদেশের শিপ ব্রেকিং: সম্ভাবনা আছে, নেই সম্প্রসারণের সদিচ্ছা

মামুন আবদুল্লাহ*

বাংলাদেশ ও ভারতের জাহাজ ভাঙার (শিপ ব্রেকিং) বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে ফ্রান্সের দুটি ঐতিহাসিক জাহাজকে কেন্দ্র করে। যার একটি বিশ্বের একসময়ের সর্ববৃহৎ ও বিলাসবহুল প্রমাদতরী এস এস নরওয়ে (প্রথমে যার নাম ছিল এস এস ফ্রান্স) এবং অপরটি ফরাসি যুদ্ধবিমান বহনকারী রণতরী 'ক্লিম্যানেস্কো'। প্রায় ৯০ কোটি টাকায় (১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) 'এসএস নরওয়ে' কেনার কথাবার্তা পাকাপোক্ত করে ফেলেছিলেন চট্টগ্রামের এক স্ক্র্যাপ জাহাজ ব্যবসায়ী, যার নিজস্ব একটি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডও আছে সীতাকুণ্ডের শীতলপুর। ওই ব্যবসায়ী মালেয়েশিয়ার কেলাং বন্দরে অবস্থানরত জাহাজটিতে দুরাত কাটিয়ে আসার পর এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে যেকোনোভাবে জাহাজটিকে ইয়ার্ডে এনে কাটার জন্য একপায়ে খাড়া ছিলেন। আমদানি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার একপর্যায়ে তিনি জাহাজটির নাম পরিবর্তন করে (এমভি ব্লু লেডি) এদেশের আনার চেষ্টাও চালান।

একই ভাবে 'ক্লিম্যানেস্কো' কেটে স্ক্র্যাপ লোহা হিসেবে বিক্রির জন্য ৪০ কোটি রুপিতে কিনেছিল ভারতীয় জাহাজ ভাঙা প্রতিষ্ঠান 'শ্রীরাম ভেসেল স্ক্র্যাপ প্রাইভেট লিমিটেড'। গুজরাটের এলাং এলাকার যেকোনো শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে ভিড়িয়ে জাহাজটি কাটার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল ওই প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অভিযোগ তোলে, এই দুটি জাহাজেই বিপুল পরিমাণ অ্যাজস্টেরজসহ মারাত্মক বিষাক্ত কিছু বর্জ্য আছে, যা জাহাজ কাটার সময় আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে জনজীবনে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করবে। তারা আরও অভিযোগ করেন, জাহাজ কাটার সময় অ্যাজবেস্টজের ছোট ছোট আঁশ বাতাসের সঙ্গে মিশে মানুষের শ্বাসনালীতে চলে যাওয়ার সম্ভবনা আছে, যা মানবদেহে প্রাণঘাতী ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এই দুই জাহাজের সম্ভাব্য আমদানিকারক এসব জানার পরও জাহাজ দুটিকে স্ব স্ব দেশে আনার তৎপরতা অব্যাহত রাখলে সোচ্চার হয়ে উঠে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন। জাহাজ দুটির আমদানি ঠেকাতে প্রায় একই সময়ে দুই দেশে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ এমনকি মানববন্ধনও রচিত হয়ে। একপর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে যেকোনো নামে এসএস নরওয়ে বাংলাদেশে আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও ক্লিম্যানেস্কোর ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়।

সংরক্ষিত খাত

শুধু এ দুটি জাহাজ নয়, এ খাতের ব্যবসায়ীরা যেকোনো ধরনের স্ক্র্যাপ বাংলাদেশে জাহাজ এনে কেটে

* চিফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, চট্টগ্রাম অফিস।

বিক্রি করে দেওয়ার সুযোগ সবসময় খুঁজতে থাকেন। তাদের বিবেচনায় মুনাফাই মুখ্য। এ মুনাফা সর্বোচ্চ করতে এখাতের ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে 'বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামের সমিতি করেছেন। এ সমিতির সদস্য না হলে জাহাজ আমদানি করা যাবে না। সমিতির বাইরে কেউ আমদানি করলে জাহাজটি ইয়ার্ডে নিয়ে যাতে কাটা সম্ভব না হয় সে জন্য সরকারি গ্যাজেটও করে নেওয়া হয়েছে। ওই গ্যাজেটে আমদানি করা জাহাজ শুল্কায়ন ও ইয়ার্ডে নেওয়ার আগে যথাক্রমে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও নৌবাহিনী থেকে যে অনুমোদন নেওয়ার বিধান রয়েছে তাতে ওই সমিতির ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর সমিতি নিয়ন্ত্রণকারী পাঁচ-ছয়জন ব্যবসায়ীর নিজস্ব ঘরনার না হলে যেকাউকে সমিতির সদস্যপদও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে দেশের শিপ ব্রেকিং খাতটি দীর্ঘ তিন দশকেও মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর জন্য সংরক্ষিত থেকেই গেল।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড-বাংলাদেশ

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা ও বর্জ্যবাহী স্ক্র্যাপ জাহাজ (ডার্টি শিপ) আমদানির জন্য বাংলাদেশি আমদানিকারকরা বেপরোয়া। কোনো না কোনোভাবে দু-একটি ডার্টি শিপ এনে কাটার ব্যবস্থা করতে পারলেই প্রত্যেক আমদানিকারকের লাভ হয় ৫-১০ কোটি টাকা। ওইসব ডার্টি শিপ বাইরের কোনো বন্দরে সম্পূর্ণ পরিষ্কার (ক্লিন অথবা বর্জ্যমুক্ত) করে আমদানি করতে গেলে তখন লাভ বলতে কিছুই থাকবে না। আবার অ্যাজবেস্টরজ জাতীয় বিষাক্ত বর্জ্যসহ জাহাজ চীন,পাকিস্তানসহ আরও কয়েকটি দেশে তাদের কঠোর নীতিমালার কারণে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। ফলে রপ্তানিকারক কম দামে হলেও জাহাজগুলো বাংলাদেশ কিংবা ভারতকে গছিয়ে দিতে পারলেই বাঁচেন। বিশেষ করে ইদানীংকালে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে অ্যাজবেস্টজসহ নানা বর্জ্যবাহী জাহাজ বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বর্জ্য অপসারণ কিংবা পরিশোধন ব্যয় অনেক বেশিতে দাঁড়ানোয় এখন বাংলাদেশই এগুলোর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

স্ক্র্যাপ জাহাজের নামে কী আসছে?

আমাদের দেশে স্ক্র্যাপ জাহাজের ঢালাও আমদানির কারণে এসব জাহাজে কোন ধরনের ধাতব পদার্থ রয়েছে সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার সুযোগ এবং সুবিধা কোনোটাই নেই। জাহাজের নাম নিয়ে কখনো ফেরি, সাগরের ভাসমান কারখানা, আবার কখনো রিফাইনারি, হিমায়িত মাছ কারখানা কিংবা লোহার কাঠামো আমদানি হচ্ছে। আমাদের দেশের সুচতুর ব্যবসায়ীরা এসব লোহার কাঠামো আমদানির আগে কৌশলে সিংগাপুর থেকেই কাঠামোটি জাহাজ বলে নতুন নামকরণ করে নিচ্ছে, যাতে এটি জাহাজ নয় সেটা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারেন। চট্টগ্রামের যেসব শিপ ব্রেকিং ব্যবসায়ীর নিজস্ব ইয়ার্ড আছে তাদের প্রত্যেকেরই আবার সিংগাপুরে কিংবা লন্ডনে নামে বেনামে অন্ত ত একটি কার্যালয় আছে। প্রথমে ওই বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে জাহাজ কিংবা লোহার কাঠামো কিনে নেন তারা। পরে আবার সেই বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের প্রতিষ্ঠান সেটি কিনে নিয়েছে দেখায়। এ কারণেই মাঝেমধ্যে একবার নাম পরিবর্তন করে নিলেও হাতে হাতে ধরার মতো কোনো সুযোগ থাকে না।

দায়িত্ব কার?

আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে এমন কোনো নির্দিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যেটি স্ক্র্যাপ

জাহাজ আমদানি এবং আমদানি পরবর্তী কাটার বিষয়টি সরাসরি তদারকি করবে। আর দশটি বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির জন্য যেভাবে শুল্ক বিভাগের ছাড়পত্র এবং শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হয় স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘোষণামতো পণ্যসামগ্রীর আমদানি সঠিক আছে কি না সেটা সরেজমিন দেখার জন্য একজন শুল্ক কর্মকর্তা যেমন বর্হিনোঙরে যাওয়ার বিধান আছে তেমন স্ক্র্যাপ জাহাজের ক্ষেত্রেও একদল শুল্ক কর্মকর্তা গিয়ে দেখে আসেন স্ক্র্যাপ জাহাজে শুল্ক আরোপযোগ্য কোনো পণ্য আছে কি না । আমদানিযোগ্য পণ্যসামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত শেষে শুল্ক আদায়ের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে আসাই এসব কর্মকর্তার দায়িত্ব। এর বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা আমদানি করা জাহাজটি কাটার উপযোগী কি না অথবা জাহাজে কোনো ধরনের বিস্ফোরফ দ্রব্য আছে কি না সেটাই নিশ্চিত করে ইয়ার্ডে আনার ছাড়পত্র দেয়। বর্জ্য আছে কি নেই সেটা দেখার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের হলেও সেটা দেখার মতো যন্ত্রপাতি কিংবা সুযোগ সুবিধা নেই বলে কোনো স্ক্র্যাপ জাহাজে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা গিয়ে আপত্তি অথবা অনাপত্তি দিয়ে এসেছেন এমন নজির বাংলাদেশে শিপ ব্রেকিংএর ইতিহাসে একটিও নেই। আর স্ক্র্যাপ জাহাজটি ইয়ার্ডে বিচিং হওয়ার আগে নৌবাহিনীও এক দফায় ওই জাহাজে গিয়ে যেসব নৌপ্রতিরক্ষামূলক যন্ত্রপাতি জাহাজটিতে আছে সেটা চিহ্নিত করে আসে। পরে এসব চিহ্নিত যন্ত্রপাতি খুলে নেয় নৌবাহিনী।

এর আগে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিতে ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রথাসিদ্ধ এলসি খুলতে হয়। তারও আগে এলসি খোলার জন্য অনুমোদন নিতে হয় সমুদ্র বাণিজ্য অধিদপ্তর থেকে। স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিতে যেখানে এতসব প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা রয়েছে সেখানে সামগ্রিক দায় দায়িত্ব কোনো একক প্রতিষ্ঠান নেবে না সেটাই স্বাভাবিক। এ কারণে এদেশে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির দায়দায়িত্ব এক সরকারি সংস্থা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ভারমুক্ত হতে চায়। ফলে পরিবেশসম্মত স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি ও কাটার বিষয়টি কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

সম্ভাবনা যেখানে

বাংলাদেশে পুরোনো জাহাজ ভাঙার (শিপ ব্রেকিং) কাজটি একমাত্র চট্টগ্রামে হয়-এটা সবার জানা থাকলেও ক্ষুদ্র এ খাতটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কত বড় অবদান রাখছে সেটা অনেকেরই অজানা। সবাই জানে এ খাত দেশের লোহার চাহিদার বড় একটি অংশের যোগান দিয়ে থাকে। বছরে ৭০০-৮০০ কোটি টাকার নিশ্চিত রাজস্ব আসে এ খাত থেকে। ৩০ হাজারের মতো লোক এ শিল্পে কর্মরত। কিন্তু এ শিপ ব্রেকিং থেকে বিপুল পরিমাণ নৌ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, উচ্চক্ষমতার জেনারেটর, ইলেক্টনিক্স পণ্য, বৈদ্যুতিক তার-বাল্ব, বাসনকোসন, চেয়ার টেবিল খাটসহ দামি দামি আসবাবপত্র থেকে শুরু করে হাজারো পণ্যসামগ্রী যে পাওয়া যায় সেটা একমাত্র এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকজন ছাড়া অন্যদের জানা কিংবা বোঝার উপায় নেই। এসব পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত হওয়ায় ফৌজদারহাট থেকে শুরু করে বারআউলিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশঘেঁষে গড়ে উঠেছে শত শত দোকান, যেখানে বিক্রি হচ্ছে ভাঙা জাহাজ থেকে প্রাপ্ত নানা পণ্যসামগ্রী। এর সঙ্গে বছরে এক শ থেকে দেড় শ কোটি টাকার বাড়তি আয়ও আসে ভাঙা জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে। এর মধ্যে আছে ব্রোঞ্জ অথবা ব্রাশের তৈরি প্রফেলার, ব্রাশ স্ক্র্যাপ, কপার স্ক্র্যাপ,স্টিলনেস স্টিল

স্ক্র্যাপ, সেফটি আইটেম, জাহাজের গোটা ইঞ্জিন ও ইঞ্জিনের স্প্যায়ার পার্টস ইত্যাদি ।

অবহেলিত খাত, নীতিমালা নেই

আমাদের দেশে নির্মাণ ও গৃহস্থালি কাজে যে লোহার চাহিদা আছে তার ৭৫-৮০ শতাংশ যোগান দেয় শিপ ব্রেকিং খাত । জাহাজ ভাঙা এ লোহা কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয় দেশের বিভিন্ন রিরোলিং মিলে । সেখান থেকে রড, বিলেট, এঙ্গেল, প্লেট ইত্যাদি তৈরি হয় । ফলে শিপ ব্রেকিং ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের অর্থনীতি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এটা অনেকখানি নিশ্চিত । কারণ ভারতসহ বিভিন্ন দেশে লোহার খনি থাকলেও বাংলাদেশ বার্ষিক লোহার চাহিদার পুরোটাই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে, যার একটি বড় অংশ পাওয়া যায় শিপ ব্রেকিং খাত থেকে । কিন্তু তিন দশক ধরে আমাদের দেশে শিপ ব্রেকিং কর্মকাণ্ড চললেও এ খাতের উন্নয়ন কিংবা অফুরন্ত সম্ভবনা কাজে লাগানোর উদ্যোগ সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়নি ।

এ খাতকে এখনো শিল্প বলেও ঘোষণা করা হয়নি । ফলে এখানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়নি কোনো বেতন কাঠামো কিংবা নীতিমালা । যার কারণে রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো থেকে দরিদ্র পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়সী শিশু-কিশোররা দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে জাহাজ ভাঙার কাজে । ভালো মজুরিতে কাজের লোভ দেখিয়ে একশ্রেণীর মধ্যসত্বভোগী দালালচক্র এদের নিয়ে আসলেও বাস্তবতা হচ্ছে, ন্যূনতম মজুরিতে এসব শ্রমিকদের দিতে হয় প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম । আর পদে পদে মৃত্যু কিংবা পঙ্গু হওয়ার ঝুঁকি তো লেগেই আছে । কিন্তু এজন্য কোনো ঝুঁকি ভাতা কিংবা আপাদকালীন আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু নেই জাহাজ ভাঙার শ্রমিকদের জন্য ।

ভিন জেলা থেকে আসা এসব শ্রমিক শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের আশপাশে যেসব ভাড়াঘরে বাস করেন সেখানকার পরিবেশও মানবেতর । কারণ প্রতিদিন যে মজুরি মেলে সেটা দিয়ে ভালো ঘরে থাকা আর পেট পুরে খাওয়া অসম্ভব । কিছু ঠিকাদার জাহাজ আমদানিকারকের কাছ থেকে ঠিকার ভিত্তিতে জাহাজটি সম্পূর্ণ কেটে দেওয়ার চুক্তি করে আর কম বেতনের শ্রমিক দিয়ে জাহাজ কাটার ব্যবস্থা করে । ফলে শ্রমিকরা আসলে কত মজুরি পেল সেটা দেখা অনেক সময় জাহাজের আমদানিকারকের পক্ষে সম্ভব হয় না । একজন ইয়ার্ড মালিকের চিন্তা থাকে তার জাহাজটি কত দ্রুত ইয়ার্ডে ভিড়িয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা যায় সেটা নিয়ে । কারণ যত তাড়াতাড়ি তিনি লোহা বিক্রি করতে পারেন তত দ্রুতই ব্যাংকের দায়মুক্ত হয়ে যান । এ কারণে জাহাজ ইয়ার্ডে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে (অনেক সময় আগেই) তিনি বিভিন্ন ঠিকাদার (লোহা, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম, আসবাবপত্র হার্ডওয়্যার ইত্যাদি) থেকে কিছু অগ্রিম টাকাও নিয়ে নেন । কাজেই যেনতেনভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থাকায় দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ খাতটি শিল্পের স্বীকৃতি পেল কি পেল না, নীতমালা আছে কি নেই– সেটা নিয়েও খুব একটা গা করে না স্ক্র্যাপ জাহাজের আমদানিকারকরা । সরকারও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নির্বিকার বলে মনে হচ্ছে ।

সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে সুষ্ঠুনীতিমালার ভিত্তিতে আমাদের দেশে জাহাজ কাটার ব্যবস্থা নিলে এ খাত থেকে সরকারি আয় যেমন বাড়ত তেমনি এটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি অবদান রাখতে পারত- এটা অনেকেই মনে করেন । কিন্তু বছরের পর বছর স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি ও কাটার বিষয়টি অব্যাহত গতিতে চললেও এনিয়ে যেন সরকারের পরিকল্পিত কোনো

উদ্যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ কোনো একটি জাহাজ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি আর পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো সোচ্চার হলে সরকার একটু নড়েচড়ে বসেন, নতুন নতুন কিছু বিধি জারি করেই স্ব স্ব সংস্থাগুলো দায়িত্বপালন শেষ করেন মাত্র। একটি শিল্পবান্ধব ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

বিপন্ন পরিবেশ-যখন তখন দুর্ঘটনা

একটি স্ক্র্যাপ জাহাজকে পরিবেশসম্মতভাবে কাটার জন্য যেসব আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা ইয়ার্ডগুলোতে থাকার কথা তার সামান্যতমও নেই চট্টগ্রামের উপকূলীয় শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে। এ জন্য বাড়তি বিনিয়োগে ইয়ার্ড মালিকদেরও আগ্রহ কম। বরং কোনোমতে ন্যূনতম বিনিয়োগে কীভাবে বড় অঙ্কের লাভ পকেটে ভরে নেওয়া যায় সে চেষ্টায় তৎপর থাকেন আমদানিকারকরা। অবশ্য একজন শিপ ইয়ার্ড মালিক আমাকে বলছেন, কর্মরত শ্রমিকদের মাথায় হেমলেট, পায়ে গামবুটসহ কিছু সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু কায়িক পরিশ্রমের সময় এসব পরিধান করে কাজ করতে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা (বেশি গরম লাগার অজুহাত) বেশি দেখিয়ে সেটা তারা করছে না। ফলে মারাত্মক প্রাণঘাতি দুর্ঘটনা ইয়ার্ডগুলোতে প্রত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্য একজন ইয়ার্ড মালিক বলেন, আমরা চাই স্থায়ীভাবে পরিবেশসম্মত ইয়ার্ড গড়ে তুলতে। কিন্তু যে ইয়ার্ডে আমি জাহাজ ভিড়াচ্ছি তার নদীমুখটা আমাদের লিজ দেওয়া হয় মাত্র এক বছরের জন্য। পরের বছর সরকার যদি লিজ দেওয়া বন্ধ রাখে তখন আমাদেরও ইয়ার্ড বন্ধ করে দিতে হবে। মূলত এ কারণে ইর্য়াডগুলোতে পরিবেশসম্মত জাহাজ কাটার স্থায়ী কাঠামো গড়ে উঠছে না বলে তিনি মনে করেন।

শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের অন্য একটি বড় সংকট পরিবেশ দূষণ। বিশালাকৃতির একটি জাহাজের বিভিন্নস্থানে থাকা তেলের তলানিসহ বিভিন্ন পদার্থ সংগ্রহ করে বিক্রির চেষ্টা করা হয় প্রথমে। কিন্তু যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না তা জাহাজ কাটার সময় সরাসরি গিয়ে মিশে বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ চ্যানেলে। এ পরিবেশ দূষণের অনেকগুলো অদৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া হলেও সংলগ্ন সন্দ্বীপ চ্যানেল যে ইতিমধ্যে মাছ শূন্য হয়ে পড়েছে সেটা বিশেষজ্ঞদের গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেশের জাহাজ ভাঙা খাতের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখতে পারিঃ

এক. এ খাতের জন্য একটি পরিপূর্ণ নীতিমালা তৈরি করে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া।

দুই. এ খাতকে শিল্পখাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারি নির্দিষ্ট একটি মাত্র সংস্থার নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করা।

তিন. পরিবেশসম্মত ও উপযুক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে জাহাজ কাটার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইয়ার্ডগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ।

চার. শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকিভাতাসহ একটি আলাদা মজুরি কাঠামো তৈরি করা।

পাঁচ. জাহাজ কাটার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রযোজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

ছয়. জাহাজ আমদানি থেকে শুরু করে কেটে লোহা হিসেবে বিক্রি করা পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য সরকারি যেকোনো একটি সংস্থাকে (পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কিংবা শুল্ক বিভাগ) দায়িত্ব দেওয়া। যে সংস্থা এ শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।

তথ্য সূত্র

End of life ships: The human cost of breaking ships, (greenpeace survey), Deadly Vessels (Indian Magazine, FRONTLINE, February 10, 2006), পর্যালোচনা-বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা কার্যক্রম-ইপসা এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাপ্ত তথ্য ও অর্জিত সরেজমিন অভিজ্ঞতা।